



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1133 - 1139

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে বাঙালি ভদ্রমহিলার পোশাক ভাবনা

স্নিগ্ধদীপ্তা মজুমদার

আর. টি. পি. স্কলার

সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, ক্যালকাটা

Email ID: snigdhadipta21@gmail.com

 009-0003-5991-7905

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Bhadramahila,
Dress, Middle-
class, Colonialism,
Control, Agency,
Sexuality, Body,
Periodicals.

Abstract

Anthropologists usually categorize the study of clothing under the umbrella of material culture. Although clothing, being a mere tangible and social thing, can be read as a silent language or a behavior. Clothing not only beautifies one's body but also depicts the identity and plays a vital role in the wearer's performance in everyday activities. In a different sense clothing can also be considered as an entity which is entangled with the concept of appearance and self-representation. It not only depicts the social positionality or the politics behind putting on a particular attire but also reflects the inner-self of the wearer. Clothes can be considered as the disguise in which we dissolve, the camouflage that allows us to keep something of ourselves in reserve. Therefore clothing can be seen or analysed from different perspectives and theoretical frameworks. Clothing or dress can also be considered as an index of racial, class, caste and gender discrimination. Therefore the purpose of this paper is to explore how dress can be considered as a tool to read gender in terms of social class. With the advent of British rule in India, especially in Bengal the introduction of English education and new bourgeois economy gave rise to the middle-class in colonial times. This introduction of English education not only refashioned the minds of the Indians with the tool of bookish knowledge but also reformed their social lifestyles. Thus the middle-class men also started reforming the antahpur (the inner quartets of their houses) with the tool of education. But in case of women's education their pre-colonial 'immodest' dress has become social a constraint. Therefore their dress has been reformed drastically. Bengali periodicals, journals, manuals of late-nineteenth and twentieth century were replete with debates and instructions of dresses for the middle-class genteel women. But these instructions on dress not only constructed them as reformed, modest wives but also snatched away their agency on their choices of clothing. Therefore this paper aims to explore how dress can be considered as a tool which can control women's body and sexuality and can make us think of the idea of agency in a different way.

Discussion

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যান্ডে নর-নারীর গার্হস্থ্য সম্পর্কের অভিমুখ ছিল মূলত উৎপাদনমূলক। এলেন জর্ডান তাঁর ‘The Women’s movement and women’s employment in nineteenth century Britain’ - গ্রন্থে জানিয়েছেন, -

“the economic base of most households in Britain was some form of family economy... And women were contributors to the family income in the way considered appropriate to their class or situation”¹ (Jordan, 12)

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়ে ইংল্যান্ডীয় নারী পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ বদলাতে থাকে। রাষ্ট্রীয় নীতির/ আদেশ ইন্সট্রাকশন অনুসারে নারী পুরুষের কাজের ধরণ যায় বদলে। মেইলিট্রা ওয়ালিগড়া তাঁর ‘Empire and the Invention of a New Femininity’ - গ্রন্থে জানিয়েছেন, -

“in the nineteenth century, in principle, men worked outside the home for wages and conducted political activities in the new public sphere, while women devoted their lives to family and household. At this time the economic man and domestic women were born alongside the supposed separation of the private and public.”²

(Waligora, 7)

নারী ও পুরুষের কর্মবিশ্বের পৃথকীকরণের ফল স্বরূপই গড়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা Burgertum। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান-ই বদলে দিল সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, যা নতুন করে গড়ে তুলল কর্ম, শিক্ষা ও পরিবারিক পরিসর। ক্ষমতাতন্ত্রের অনুশাসন যেমন ইংল্যান্ডে গড়ে তুলল Burgertum, তেমনই ইংল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হিসেবে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশেও গড়ে উঠেছিল ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী যার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক কাঠামো। যে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি পুরুষেরা পূর্বতন জীবনযাত্রা ও জীবিকা পরিত্যাগ করে বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে পরিশ্রমসাম্য সরকারি কাজে যোগদান করেছিলেন, তারাই হয়েছে উঠেছিলেন তৎকালীন ‘ভদ্রলোক’। এই পেশাগত পরিবর্তনের কারণেই এই নবতর ভদ্রলোকেরা অনুভব করেছিলেন সংস্কারিত পারিবারিক পরিসর। তাই তাঁদের চাহিদানুসারে ও ইংল্যান্ডীয় প্রথার আদলে বঙ্গদেশে নির্মিত হয়েছিল নব্য ‘পারিবারিক’ পরিসর, যার চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিলেন উনিশ শতকীয় নারীরা। হুমায়ুন আজাদ তাঁর নারী গ্রন্থের ‘বঙ্গীয় ভদ্রমহিলা : উন্নত জাতের নারী উৎপাদন’ অধ্যায়ে লিখছেন -

“উনিশ শতকে উৎপন্ন হয় এক নতুন জাতের নারী, যার সাথে মিল নেই তার পূর্বজাতের। যে প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তারা, তার নাম শিক্ষা। শিক্ষার ফলে উৎপন্ন অভিনব নারীদের বোঝানোর জন্যে দরকার পড়ে অভিনব শব্দ, তাদের জন্যে ইংরেজির অনুকরণে তৈরি করা হয় এক অভিনব শব্দ, ভদ্রমহিলা। সমাজে তারা দেখা দিয়েছিল প্রপোঞ্চরূপে, সমাজ তাদের চেয়েছে এবং চায়নি। এ-ভদ্রমহিলারা হয়ে আছে পুরুষতন্ত্রের স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন।”³ (আজাদ, ৩২)

পুরুষতন্ত্রের স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে মোড়া ভদ্রমহিলারা যে শিক্ষা নামক পরিচ্ছদ পরিধান করেছিলেন সেই শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত পরিসরে আটকে থাকেনি। বরং নারীর সার্বিক উন্নতি সাধনের পথকে প্রশস্ত করে ছিল। তাঁদের রুচি, চাল-চলন, পোশাক-আশাক গেছিল বদলে। যদিও এই সার্বিক উন্নতির আড়ালেও ছিল কড়া রাষ্ট্রীয় ও পুরুষতান্ত্রিক ‘নজরদারি’ (surveillance)। তবে নারীর পুঁথিগত ও সার্বিক শিক্ষার অগ্রসর হওয়ার পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হেতু হয়ে উঠেছিল তাঁর পোশাক। ফলে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই ‘ভদ্রমহিলা’ নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পোশাক-সংস্কার শুরু হয়। যদিও ভদ্রমহিলার গড়ে ওঠার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য নয়। বরং ঔপনিবেশিক সময়পর্বে পোশাক সংস্কারের রাজনীতি ও সংস্কারিত পোশাক ভাবনার ইতিহাস নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ‘ভদ্রমহিলা’র অবস্থানকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস এই গবেষণা পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা দেখব ভদ্রমহিলার পোশাক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তার ‘যৌনতা’ তথা ‘যৌন-শরীর’-এর

রাষ্ট্রীয় অবদমন এবং সংস্কারিত পোশাক পরিহিতা সাংস্কৃতিক। এই ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা নির্বাচিত সাময়িক পত্রকে নথিখানা হিসেবে ব্যবহার করব। কারণ এই ‘ক্ষেত্র’টিতেই মহিলারা নিজেরা এবং অবশ্যই পুরুষেরা তাঁদের পোশাক-ভাবনা কেন্দ্রিক নানান তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করেছেন। আধুনিক গবেষণা ও তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে সাময়িক পত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র’। আমরা জানি যে উনিশ শতকীয় বঙ্গদেশে সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রচলন শুরু হয়। এই পত্র-পত্রিকার ভাষার হয়ে ওঠে আমাদের কাছে এক ধরনের ‘পাবলিক স্ফিয়ার’ বা জনপরিসর, এবং এই পরিসরে নারী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সাথে, ভদ্রমহিলার পোশাক সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্কারিক বিধানের জনমতও গড়ে ওঠে পুরুষ ও মহিলা দুইয়ের স্বরেই। অতএব, একটি জনপরিসরে কীভাবে পোশাক বা ‘যৌনশরীর’ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার অবকাশ তৈরি হচ্ছে সেটিও দেখার চেষ্টা করব। তবে যেহেতু আমাদের এক্ষেত্রে স্থান সীমিত, আমরা বামাবোধনী, ভারতী ও অন্তঃপুর এই তিনটি সাময়িক পত্রকেই নথিখানা হিসেবে ব্যবহার করেছি। কারণ এই তিনটি সাময়িক পত্রই বঙ্গমহিলার সার্বিক উন্নতি সাধনার্থে প্রকাশিত হত।

তবে এই প্রশ্নগুলিতে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। প্রথমটি হল তৎকালীন সময়ে বঙ্গদেশে পোশাকের পরিস্থিতিটি কেমন ছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘সেকাল আর একাল’ গ্রন্থে আক্ষেপ করেছেন যে, -

“সমস্ত জাতির নিজস্ব পরিচ্ছদ থাকলেও আমাদের তা নেই। কোনো মজলিশে যাউন, একশত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন, পরিচ্ছদের কিছুমাত্র সমতা নেই। ইহাতে এক একবার বোধ হয়, আমাদের কিছুমাত্র জাতিত্ব নাই।”^৪ (রাজনারায়ণ বসু, ২৩)

স্পষ্টতই, রাজনারায়ণ এখানে পোশাককে জাতিত্ব বোধের একটি প্রধান প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ‘কোট বা চাপকান’ প্রবন্ধে লিখেছেন, -

“তাহার পর বলিবার বেলায় সুর ধরিলেন যে তোমাদের কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদের এই বেশ ধরিতে হয়েছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে। কিন্তু তোমাদের কাপড় নাই সে আরো খারাপ।”^৫ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০২)

ফলে এ কথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না উনবিংশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আমাদের জাতীয় পোশাক হিসেবে তেমন কোনো পোশাক বিধি গড়ে ওঠেনি। অন্তত পুরুষের ক্ষেত্রে তেমনই হৃদিশই পাওয়া যাচ্ছে। নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য কিছুটা হলেও ভিন্ন। আমরা সেদিকে একটু আলোকপাত করব। ১৮৩৫ সালের ১লা অগাস্ট সমাচার দর্পণ-এ একটি চিঠি চাপা হয়েছিল। প্রেরকের নাম হিসেবে লেখা হয়েছিল ‘কস্যচিৎ বিদেশিন’। এই চিঠিতে মেয়েদের অন্তঃপুরের পোশাক সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়। প্রেরক লিখছেন -

“এতদ্বন্দ্বীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকের ঘৃণারহ... যেহেতুক বর্তমান ব্যবহার অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্বোৎকর্ষভাষ্যক বস্ত্র স্ত্রীলোকের তাদৃশ সমভ্রম সম্ভবে না, যদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্বোৎকর্ষভাষ্যক বসনে হয়।”^৬ (কস্যচিৎ, বিদেশিন, ৭৮)

আবার কৈলাশবাসিনী দেবী তাঁর ‘হিন্দুমহিলাদিগের হীনবস্থা’ (১৮৬৩) প্রবন্ধে আমাদের জানাচ্ছেন -

“বাঙালি মহিলাদের এমন কোনো পোশাক নেই যা পরিধান করে তাঁরা বাইরে যেতে পারেন। শুধুমাত্র বিদেশী নারীর পোশাক পরিধানই তাঁর একমাত্র উপায়। যদিও এই ধরনের পোশাক সকলের পক্ষে পরিহার করা সম্ভব নয় ফলে কৃষ্ণভাবিনীও এক্ষেত্রে পরোক্ষ বঙ্গমহিলার নতুন পোশাক আগমনের আকাঙ্ক্ষা করেছেন।”^৭ (কৈলাশবাসিনী দেবী, ২৫)

ঔপনিবেশিক সময়পর্বের পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালি মহিলারা অন্দরমহলেই থাকতেন। আর তাঁদের পরিধেয় শাড়ি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরে বাহির মহলে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক কথায় সে পোশাক ছিল অশালীন। দেখা যায় যে কৃষ্ণভাবিনী মহিলাদের নতুন ধরনের পোশাকের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও শিবচন্দ্র স্পষ্ট ভাষাতেই মহিলাদের ‘অশালীন’

পোশাক সংস্কার প্রয়োজনের কথা বলছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে দেবেন্দ্রনাথও চাইতেন তাঁর পরিবারের মহিলারা পুরুষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করুক এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের প্রথম শর্ত হিসেবেই তাঁদের তৎকালীন ‘অশালীন’ পোশাকের সংস্কার করার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। ফলে আমরা বলতে পারি যে পুরুষরাই (পুরুষতন্ত্র) বাঙালি মহিলার ‘অশালীনতার’ বোধকে, তার যৌন শরীরকে পোশাক সংস্কারের আছিলায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল।^৮ (Meredith, Borthwick, ২৪৩)

আমরা আগে বলেছি যে আমরা প্রধানত তিনটি সাময়িক পত্রিকাকে আমাদের এই পত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। আমাদের তর্কিক অভিমুখকে কিছুটা দৃঢ় করতে আমরা অন্তঃপুরের প্রথম সংখ্যার ভূমিকার দিকে নজর দেব অন্তঃপুর পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনাতে লেখা হচ্ছে, -

“রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছি। ... কেবল বঙ্গ রমণীদিগের উন্নতিকল্পে আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।”^৯ (বনলতা দেবী, ১-২)

এ কথা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে - এই পত্রিকাগুলি মূলত মহিলাদের উন্নতিসাধনার্থেই প্রকাশিত হত। ফলে এই উন্নতিসাধনের একটি ক্ষুদ্র একক হিসেবে পোশাক সংক্রান্ত ভাবনাকে আমরা এই পত্রিকাগুলি থেকেই বোঝার চেষ্টা করব।

ক্রমানুসারে দেখতে গেলে এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে প্রথমেই আসছে বামাবোধিনীর প্রসঙ্গ। ১৮৬৩ সালে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রথম বামাবোধিনী প্রকাশিত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকার ১২৭৫ সালের কার্তিক সংখ্যায় ‘সূক্ষবস্ত্র’ শীর্ষক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। এই পদ্যে পোশাকের উপযোগিতা সম্পর্কে ‘বামগণ’-কে অবহিত করা হচ্ছে এবং সূক্ষবস্ত্র পরিধান অত্যন্ত অবিধেয় কেন সেই সম্পর্কেও তাঁদের বিধান দেওয়া হচ্ছে। শেষপর্যন্ত এই কথাও বলা হচ্ছে যে এই সূক্ষবস্ত্র পরিধান করে অসৎ পুরুষের দৃষ্টিতে পড়লে তা রমণীগণের পক্ষে অসম্মানজনক বা লজ্জাজনক হয়েছে পড়বে। পদ্যটির কয়েকটি লাইন আমরা দেখতে পারি -

“সম্বধিয়া গুরু কন প্রিয়তম বামগণ

শুনো আজি বসন বিষয়,

সংক্ষেপে কহিব তার দোষ গুণ ব্যবহার

কিবা মন্দ কিসে ভালো হয়।

অতি সূক্ষ্ম পরিধেয় পরা অতি অবিধেয়

উভয়েরি পুরুষ রমণী।”^{১০} (অজ্ঞাতনাম, পৃ. ১৩-১৫)

পদ্যের প্রথম অংশে সূক্ষবস্ত্রের পরিধান না করার বিধান দেওয়া হচ্ছে পুরুষ এবং নারী উভয়কেই এবং এরপর বস্ত্র পরিধানের ‘উপযোগিতা সম্পর্কে অবগত করা হচ্ছে -

“শীত বাত নিবারণ সভ্যতার সম্পাদন

আর লজ্জা করা নিবারণ

এই কয় প্রয়োজন প্রধানত সুসাধন

করিবারে বসন ধারণ।”^{১১} (অজ্ঞাতনাম, পৃ. ১৩-১৫)

তবে এখানেই শেষ নয়। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের পক্ষেই সূক্ষবস্ত্র পরিধান অবিধেয় হলেও একজন মহিলা যদি এই সূক্ষবস্ত্র পরিধান করেন তবে তার ক্ষেত্রেই সেটি অনেক বেশি অসম্মানজনক হয় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ সে অসৎ পুরুষের দৃষ্টির কবলে পড়তে পারে। ফলে পুরুষের দৃষ্টি বা ‘male gaze’-কে এড়ানোর জন্যেই নারীদের সূক্ষবস্ত্র এড়িয়ে যাওয়া উচিত বলে এই পদ্যের কথক মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে পদ্যটি কোনো নারী বা পুরুষ রচনা করেছেন সেটা বোঝা না গেলেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে পোশাকের মধ্যে দিয়ে নারীর ‘শালীনতা’ রক্ষার, অন্যকথায়, তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। কবিতার শেষে রমণীদের কোন স্থানে কী ধরণের পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত সেই বিষয়েও বিধান দেওয়া হচ্ছে -

“শুনো গো ভগিনীগণ! করিতেছি নিবেদন

স্থানান্তর করিতে গমন,

হও কিছু সাবধান পটুবন্ত্র পরিধান করি সবে করিয়া যতন।

থাকিবে পিরান গায় দুষ্য না ভাবিও তায়

তাহা অঙ্গ করে আবরণ।^{১২} (অঞ্জাতনাম, পৃ. ১৩-১৫)

পিরান এবং পটুবন্ত্র পরিধান করে বাইরে গেলে নারীর শরীর পুরুষের ‘অসৎ দৃষ্টি’ থেকে রক্ষা পাবে ফলে তাঁদের সেই পোশাক পরিধান করার বিধান-ই দেওয়া হচ্ছে। আবার বামাবোধনীর ৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হচ্ছে - এদেশের স্ত্রীগণ যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এদেশে চলিত বলিয়াই তাহাকে কেহ দোষ বোধ হয় না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, ইহা কেবল উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিয়া গায়ে একটি আবরণ দিয়া রাখা মাত্র। ...ইহাতে... শীতবাতদির ক্লেশ নিবারণ বা ভদ্রতা রক্ষা, পরিচ্ছদ ধারণের যে দুটি প্রধান প্রয়োজন তাহা কোনোরূপেই সম্পন্ন হয় না।^{১৩} (অঞ্জাতনাম, ৩)

আবার ওই সংখ্যার ‘স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী’ প্রবন্ধে বলা হচ্ছে রমণীরা পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে অবগহন পূর্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন। ‘স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটি খাইয়া পুরুষদিগের অপর পার্শ্ব দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালী ক্রমে গাত্র মার্জন ও বস্ত্র ধৌতি করেন এটি দেখিয়া কোন ভদ্রলোক ইহার প্রতিবিধান না করিয়া থাকিত’^{১৪} (অঞ্জাতনাম, ১৮)। এই বাক্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মহিলাদের স্নান প্রণালীর ক্ষেত্রেও তাঁরা কীভাবে স্নান করবেন এবং সেই ক্ষেত্রেও তাঁদের শালীনতার বোধ ঠিক করে দেবে কোনো ‘ভদ্রলোক’। এরপর ভদ্রবাড়ির মহিলাদের স্নান প্রণালীর সমালোচনাও আমাদের চোখে পড়বে। ফলে উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজ যে বারবার নারীর শালীনতার বোধকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মাপতে চেয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নারী-শরীরকে নিয়ন্ত্রণ এবং তার যৌনতা প্রকাশের অবদমনের প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তাঁদের পোশাক। এই পোশাক একদিকে যেমন নারীর উন্নতি (তৎকালীন একটি বহু-প্রচলিত শব্দবন্ধ ছিল ‘ইম্পুভমেন্ট’) সাধনের, মূলত শিক্ষার, পথ খুলে দিয়েছিল তেমনই তাকে অবদমনের প্রক্রিয়াও হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বামাবোধনী পত্রিকায় প্রকাশিত সৌদামিনী খাস্তগীরের লেখা ‘লজ্জা’ প্রবন্ধটির উল্লেখ করতেই হয়। এই প্রবন্ধে মহিলাদের ‘শরীর’ এবং পোশাকের সম্পর্কটিকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে -

“বঙ্গীয় স্ত্রীগণ তদ্রূপ করিলে প্রশংসনীয় হওয়া দূরে থাকুন, জঘন্য রূপে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের ও সকলের সহিত আলাপের পরিবর্তে অবগুষ্ঠন দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। কিন্তু অবগুষ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া কাহাও সঙ্গে আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে। বরং লোকের সহিত আলাপাদি না করাতে অহংকার প্রকাশ পায়।^{১৫} (সৌদামিনী খাস্তগীর, ১৮)

ফলে এখানেও নারীর শরীর এবং তার পোশাক ও ব্যবহারকে একই সূত্রে বেঁধে দেখতে চাওয়া হয়েছে। তার ব্যবহারেও মার্জিত ‘শালীনতা’র ছাপকে নির্দিষ্ট করে তুলতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও বামাবোধনী পত্রিকায় আরো কিছু প্রবন্ধ, যেমন, ‘বঙ্গদেশের পরিচ্ছদ’, ‘পরিচ্ছদ ও ভূষণ’, ‘লজ্জাশীলতা’, ‘সেলাই শিক্ষা’ তেও আমরা দেখব নারীর পোশাক পরিধানের প্রথাগত রীতি-নীতি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ‘শালীনতা’র বোধকে বার বার বাঙালির রেফর্মড মনন কীভাবে দেখতে চেয়েছে সেই দিকটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ভারতী পত্রিকার দিকে তাকালে সেখানেও আমরা দেখতে পাব উনিশ শতকের মহিলাদের পরিচ্ছদ সংক্রান্ত নানা ভাবনা, বলা ভালো, তর্ক-বিতর্ক উঠে এসেছে। এর মধ্যে কিছু প্রবন্ধে রয়েছে আবার বয়নশিল্পের কথাও - যেমন ‘বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যা’, ‘পটুবন্ত্র’, ‘শমতত্ত্ব’, ‘বয়নবিদ্যা বা তাঁত শিক্ষা’, ‘পরিচ্ছদ পরিচরিকা’ প্রভৃতি। মহিলাদের পোশাক ভাবনার পাশাপাশি বয়ন শিল্পের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কেও এই পত্রিকা পাঠককে অবগত করে তুলছে, যদিও বয়নশিল্পের বিষয়টি এই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বামাবোধনীর মত বিপুল পরিমাণ লেখা ভারতীতে না থাকলেও কিছু প্রবন্ধ আমরা দেখতে পাব

যেমন ‘গাউন শাড়ি’, ‘লজ্জা’, ‘স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও দেহভঙ্গি’, ‘ইংরেজি ও বাংলা পোশাক’ প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে আমরা দুটি প্রবন্ধের উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমটি ১৩৩০ সালে প্রকাশিত ভারতীয় একাদশ সংখ্যায় জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘গাউন-শাড়ী’। এই প্রবন্ধে জ্যোতির্ময়ী লিখছেন –

“অধিকাংশ শিক্ষিতা মেয়ে শতকরা ৯৯ জন বললে অত্যাধিক হবে না, শাড়িকে যেরকম রুচির ও শোভন মনে করেন, গাউনকে সেরকম করেন না। আমাদেরই পরিচিতা গাউন-পরিহিতা ভারতবর্ষীয়দের জিজ্ঞেস করে এই উত্তর পেয়েছি, ‘ভাই আমাদের কাজের খাতিরে পথে চলাফেরা করতে হয়, শাড়ি পরে চলাফেরা করলে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারি না, তাই গাউন পরি।’”^{১৬} (জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, ১০৫৫-৫৬)

এই প্রবন্ধ থেকে দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক, বাঙালি মহিলার পোশাক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির ‘আধুনিকতা’র এবং ‘দেশিয়তা’র নতুন মাত্রা নির্ণিত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক পোশাকের ধারাকে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত করলেও তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে না। বরং ঔপনিবেশিকের পোশাককে পরিগ্রহণ করার একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারাই উৎপাদিত/ নির্মিত হচ্ছে বাঙালি ‘ভদ্রমহিলা’। বাঙালি মহিলার সংস্কারিত পোশাকের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে জাতীয়তার বোধ এবং এই জাতীয়তার বোধ ও পরিগৃহীত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিই নির্মাণ করছে বাঙালির নবতম ‘আধুনিকতা’। আবার ওপর দিকে এই প্রবন্ধ বাঙালি মহিলার পোশাক তার লজ্জা নিবারণ তথা পুরুষের অসৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে। ফলে ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে বঙ্গমহিলার পোশাক ভাবনার ইতিহাসের দিকে তাকালে বারবার তার শরীরকে অ-যৌনকরণের (de-sexualization) প্রক্রিয়াই আমাদের চোখে পড়বে। এছাড়াও ‘স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও দেহভঙ্গি’ এবং ‘লজ্জা’ প্রবন্ধদুটির দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাবো বাঙালি মহিলার শরীরকে তার লজ্জার তথা শালীনতার বোধকে বারবার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাই করা হয়েছে।

‘অন্তঃপুর’ পত্রিকায় বাঙালি মহিলার পোশাক সংক্রান্ত তেমন বিশেষ প্রবন্ধ পাওয়া যায় না। তবে আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় সম্পাদিকার কলমে ‘মহিলার পরিচ্ছদ’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ওই সংখ্যাতেই অন্তঃপুরের বিজ্ঞাপন অংশে মহিলাদের পোশাক সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং ‘স্ত্রীলোকদিগের অর্থকরী শিল্পশিক্ষা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেখানেও মহিলাদের সেলাই করে অর্থ উপার্জনের প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘মহিলাদের পরিচ্ছদ’ সম্পাদকীয়টি আমাদের গভীরে গিয়ে পড়তে হবে। সম্পাদিকা লিখছেন যে আর্থনারীরা যেমন নিজেদের ইচ্ছে অনুসারে সমস্ত কাজ করলেও মুসলমান অধিকারের পরবর্তী সময়ে তাদের সতীত্ব রক্ষার্থে তাদেরকে ঘরের ভিতরেই থাকতে হত। তবে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে মহিলাদের পরিস্থিতি বেশ কিছুটা উন্নত হয়েছে। এবং তার ফলেই বঙ্গমহিলার পোশাক পরিচ্ছদেরও উন্নতি হয়েছে। তিনি বলছেন, - ‘এ দেশে ইংরাজ জাতির আগমনে ও তাহাদের সহিত মেশামিশি দ্বারা... আমরাও নানাপ্রকার সেমিজ, পেটিকোট, বডি, জ্যাকেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় এমন কোনো স্ত্রীপরিচ্ছদ ছিল না, যাহা পরিধান করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা যাইতে পারিত’।

এ ক্ষেত্রেও জাতীয়তারবোধ কাজ করছে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের পিছনে। আবার অন্যদিকে লজ্জা নিবারণ বা শালীনতাকেও রক্ষা করার প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে আমরা এই তিনটি পত্রিকা থেকে ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাঙালি মহিলার পোশাক ভাবনার যে ইতিহাস দেখতে পেলাম সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে বাড়ির মহিলাদের ভদ্রমহিলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী যে পোশাক সংক্রান্ত নব বিধান গড়ে তুলেছিলেন তা আসলে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনেরই নামান্তর। বিত্তবান শ্রেণীর পুরুষেরা নারীদের রেফর্মড বা শিক্ষিত অবস্থায় দেখতে চাইলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিসরে শিক্ষিত মহিলাদের পদার্পণ বাঙালি পুরুষতন্ত্রের কাছে একধরনের উৎকর্ষ (anxiety) জন্ম দিয়েছিল। এবং ভিক্টোরিয়ান যুগের শ্লীললতা ও অশ্লীলতার কোডগুলিও বাঙালি পুরুষতন্ত্র আত্মস্থ করেছিল সর্বতভাবে যার ফলে মহিলাদের শরীর ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বারবার। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙালি মহিলার শরীরকে ‘negative signifier’ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলে ‘আধুনিকতা’ নামক প্রকল্পের মধ্যে যে বাঙালি নারী

উৎপাদিত হয়েছিল এই সংস্কারিত পোশাক নামক 'tool' দিয়ে তাকে বিচার করলে এইটুকু আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে তাঁর উন্নতিসাধনের আছিলায় তাঁকে বাইরের জগতে প্রবেশের পথ খুলে দিয়েও তাঁকে বন্ধন যুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। ফলে এই সংস্কারিত পোশাকের মাধ্যমে বাঙালি ভদ্রমহিলার নির্মাণকে বোঝার মধ্যে দিয়ে আমরা তার 'hegemonised' অবস্থানকে বুঝতে সক্ষম হই, নির্মাণ করতে পারি তার যৌনতার নবতম 'স্থানাঙ্ক'।

Reference:

১. Jordan, Ellen. *The Women's movement and women's employment in nineteenth century Britain*. Routledge, 1995, p. 12
২. Waligora Von, Melitta, *Empire and the Invention of New Femininity in the Second Half of the Nineteenth Century*, Suedasien, 2007, p. 7
৩. আজাদ, হুমায়ুন, বঙ্গীয় ভদ্রমহিলা উন্নত জাতের নারী উৎপাদন, *নারী, নদী*, ১৯৯২, পৃ. ৩২
৪. বসু, রাজনারায়ণ, *সেকাল আর একাল*, নিউ প্রেস, ১৭৮৪, পৃ. ২৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কোট বা চাপকান, *সমাজ*, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ. ১১২
৬. বিদেশিন, কস্যচিত, চিঠি, *সমাচার দর্পণ*, অগাস্ট, ১৮৩৫, পৃ. ৭৮
৭. দেবী, কৈলাশবাসিনী, হিন্দুমহিলাদিগের হীনবস্থা, *কৈলাশবাসিনী রচনা সমগ্র*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১৯, পৃ. ২৫
৮. Borthwick, Meredith, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905*, Princeton University Press, 1984, p. 243-244
৯. দেবী, বনলতা, সম্পাদকীয়, *অন্তঃপুর*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০৫, পৃ. ১-২
১০. অঞ্জাতনাম, সূক্ষ্মবস্ত্র, *বামাবোধনী পত্রিকা*, ১২৭৫, পৃ. ১৩-১৫
১১. তদেব
১২. তদেব
১৩. অঞ্জাতনাম, সম্পাদকীয়, *বামাবোধনী পত্রিকা*, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১২৭৬, পৃ. ৩-৪
১৪. অঞ্জাতনাম, স্ত্রীলোকদের জ্ঞানপ্রণালী, *বামাবোধনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৬, পৃ. ১৮
১৫. খাস্তগীর, সৌদামিনী লজ্জা, *বামাবোধনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৬, পৃ. ১৮
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী, গাউন-শাড়ি, ভারতী, ৪৭ বর্ষ, ১৩৩০, পৃ. ১০৫৫ - ১০৫৬